সুন্দরবনের ডাকাত

`w¶Y-cwðgvÂ‡ji mšÍvmx‡`i wbivc` AÂj m›`ieb| †h †Kv‡bv AcKg K‡i Zviv Avkq †bq m›`ie‡b| `xNKvj a‡i m›`ieb wbqšY Ki‡Q K‡qK `j WvKvZ| Ljbv AÂ‡ji wewfb mg‡qi Kwgkbvi‡v GB WvKvZ `‡ji Avkq-ckq`vZv| m›`ieb AÂ‡ji GB WvKvZ‡`i `xNw`b a‡i †`L‡Qb kvnwiqvi BgwZqvR| Zvi GB †jLv †_‡K Rvbv hv‡e m›`ie‡bi wbqšK‡`i RxebwPî...

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ। সুন্দরবনের প্রান্তবর্তী গোলখালী গ্রাম থেকে আড়াপাঙ্গাসিয়া নদী ধরে তিন বাঁক দক্ষিণে নেমে পশ্চিম পাড়ে নৌকা লাগিয়ে বসে আছি। এদিকটার জঙ্গল বেশ আঁটোসাঁটো, মানুষখেকো বাঘের উৎপাত বেশ। গত বছর এখানকার গরান কাটতে এসে সতেরো জন বাঘের হাতে মারা পড়েছে। এবার দু'জন। খোলা নৌকা, সেজন্য পাড় থেকে দূরত্ব রেখে চাপান দেয়া ছিল। বিকেলের দিকে ভাঁটা পড়েছে। আমাদের সঙ্গের কয়েকজন ফটোগ্রাফার আর তিনজন মৌয়ালসহ সশস্ত্র বনমাঝি জঙ্গলে নেমেছে। একজন বনমাঝি আর মাঝিসহ আমরা মৌয়ালদের নৌকার সঙ্গে নৌকা বেঁধে কথাবার্তা বলছিলাম মৌয়ালদের ডিঙ্গি নাইয়ে মোশাররফের সঙ্গে। ডিঙ্গি নাইয়ের দায়িত্ব নৌকা নিয়ে মৌয়াল দলের কাছাকাছি থাকা, রান্নাবান্না করা আর দরকারে ডাকাতদের সঙ্গে আপসরফায় আসা। বছর তিনেক আগে মোশাররফ ডাকাতদলের হাতে ধরা পড়ে ১০ দিন আটক থাকার পর ১০ হাজার টাকার মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পায়। সেই থেকে ডাকাতদলের সঙ্গে তার পরিচয়। অন্যান্য দলের চলাচলের খোঁজ-খবরও রাখে। আমরা যেখানটায় বসেছিলাম তার ঠিক উল্টো পাড়ে কুঞ্চির ভারানি। ওদিকটা দেখিয়ে মোশাররফ জানালো, দেখতে তো পাচ্ছেন দু'দিন খোঁজাখুঁজি করেও নৌকা ছাওয়ার গোলপাতা পাইনি। কুঞ্চির খালে গোলপাতার ঝাড় আছে, কিন্তু ওদিকে কে যাবে, ডাকাইতে ভর্তি। বন বিভাগ কিছু বলে না? জিজ্ঞাসা করলাম। এবার সঙ্গী বনমাঝি নড়েচড়ে বসে বলল, স্যার ওই যে ভারানি দেখছেন ওর অনেকগুলো মুখ। তার ওপর ভারানিগুলোতে ভাঁটায় পানি থাকে না। ট্রলার আটকে যায়। ধাওয়া খেয়ে জঙ্গলে উঠে গোলাগুলি করলে জান বাঁচাবো, না হাতিয়ার বাঁচাবো। আর হাতিয়ারের অবস্থা তো এই দেখেন, দশটা গুলি করলে তিনটা ফোটে।

তাকিয়ে দেখলাম মান্ধাতার আমলের মার্ক থ্রি রাইফেলটির দিকে। জংধরা জীর্ণ যন্ত্রটির ভাঙা বাঁট কোনো রকমে আঁটা রয়েছে। গানশেলের অবস্থা তথৈবচ। বুলেটগুলোর তলায় যেখানে ফায়ারিং পিন আঘাত করবে, সেখানটার তামা মরচে পড়ে সবুজ হয়ে আছে।

মোশাররফের কাছে শুনতে পেলাম এই এলাকায় সবচেয়ে বড় বাহিনী মোতালেব ডাকাতের। গত বছর সে যৌথবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে। দুটো বিয়ে করেছিল। দ্বিতীয় স্ত্রী যশোর এলাকার। দুই সতীনের ঝগড়ায় যশোরে ধরা পড়ে সে। যৌথবাহিনীর ইন্টারোগেশনে মোতালেব স্বীকার করে সুন্দরবনের পাটকোষ্টা বন বিভাগের টহল ফাঁড়িতে তার কিছু অস্ত্র রাখা আছে। যৌথবাহিনীর সদস্যরা মোতালেবকে পাটকোষ্টা ক্যাম্পে নিয়ে এসে ১১টি অস্ত্র উদ্ধার করে। মোতালেব বাহিনীর অন্য কাউকে ধরতে পারেনি।

যৌথ বাহিনীর লোকজন চলে গেলে মোতালেব বাহিনীর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হাফিজ (মোতালেবের জামাই) লোকজনসহ পাটকোষ্টা ক্যাম্পে হাজির হয়ে ক্যাম্প ইনচার্জসহ অন্যদের পিটিয়েছে। সঙ্গের বনমাঝি বলল, স্যার হইছে কি শোনেন। তার ভাষ্যমতে, মোতালেব বাহিনীর হাতে অন্তত ৩০-৩৫টি হাতিয়ার আছে। আর বন বিভাগের জঙ্গলের ভেতরের ক্যাম্পগুলোয় কেজো-অকেজো রাইফেল থাকে দুই থেকে চারটি। এই বিশাল অস্ত্র ও লোকবলের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা বনবিভাগের নেই। তাই বাধ্য হয়ে অনেকটা জীবনের ভয়ে ডাকাতদলকে ক্যাম্পে থাকার অনুমতি দেয়। ক্যাম্পের বাবুর্চি ডাকাতদের জন্য রান্নাও করে।

এ রকম কয়েকটি ক্যাম্পই ডাকাতের অধিকারে রয়েছে। ভ্রমণ আয়োজন প্রতিষ্ঠানের এক কর্মকর্তা জানালেন, কিছুদিন আগে কয়েকজন ভ্রমণকারী নিয়ে তাদের জাহাজ গিয়েছিল সুন্দরবনের দক্ষিণ অভয়ারণ্যের

কেন্দ্রীয় কার্যালয় মাদারবাড়িয়ায়। অভয়ারণ্য এলাকায় গাছ কাটা, মাছ ধরা, মধু সংগ্রহ করা নিষেধ। ফলে জেলে, বাওয়ালী, মৌয়ালরা আইনত অভয়ারণ্য এলাকায় প্রবেশ করবে না। ভ্রমণকারী দল বন বিভাগের লোকজন ছাড়াও কিছু লোক দেখতে পায়, যাদের আচরণ জেলে-বাওয়ালীদের মতো নয়। বন বিভাগের একজন বোটম্যানকে একান্ত ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, সে বলে, বুঝতেই তো পারছেন, আপনারা তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যান। এরপর আর দেরি করেনি ভ্রমণকারীদল।

মৌয়াল মোশাররফের কাছে তার অপহরণের কাহিনী শুনলাম। দোবেকীর দুই বাঁক দক্ষিণে মালঞ্চ নদীতে তাদের নৌকা ১০-১২ জনের ডাকাতদল দখল করে নেয়। মোশাররফকে রেখে দলের অন্যদের ছেড়ে দেয় এই শর্তে যে, তিন দিনের মধ্যে দলের লোকজন দশ হাজার টাকা দিয়ে মোশাররফকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। এর মধ্যে কোস্টগার্ড ঐ এলাকায় টহল দিতে থাকলে ডাকাতদল আরও পশ্চিমে সরে পড়ে। মৌয়ালরা টাকা নিয়ে এসেও মোশাররফের হদিস পায়নি। ১০ দিন পর ডাকাতদল টাকা হাতে পেয়ে মোশাররফকে ছেড়ে দেয়। মোশাররফকে একটি ছোট নৌকায় আরও তিনজন বন্দিসহ ছোট একটি খালে বেঁধে রাখা হয়েছিল। দিনে একবার রান্নার কাজ মোশাররফকে দিয়ে করাতো। এক দিন হরিণ মেরে খাওয়া হয়েছে। ডাকাতরাও সমস্যার মধ্যে ছিল। কিছুদিন আগে তাদের একজন বাঘের পেটে যায়।

পরদিন দুপুরবেলায় আমরা নলিয়ান রেঞ্জের শেখেরট্যাক খালে জাহাজ রেখে বিখ্যাত শেখেরট্যাক মন্দির দেখে ফিরে আসি বিকেলে। ইচ্ছে ছিল পরদিন সকালে বড়বাড়ী দেখে জাহাজ ছাড়বো। সঙ্গের বনমাঝিরা উসখুস করছিল। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম রাতে আমাদের জাহাজ এখানে রাখার ইচ্ছায় তারা আতঙ্কিত। এটা নাকি ডাকাতদল হাফিজ বাহিনীর চলাচলের পথ। অতএব, চারজন সশস্ত্র বন কর্মচারী সঙ্গে থাকার পরও আমরা বীরের মতো পশ্চাৎপসারণ করে আদাচাকী বন অফিসের সামনের নদীতে রাত কাটাতে এলাম। অফিস থেকে সাবধান করা আছে, আমরা যাতে অফিস এলাকা থেকে বেশি দূরে চলে না যাই। সামনে ভারানী আছে, গোনের সময় ডাকাত থাকার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

পূর্বাঞ্চলে কালুর দল সবচেয়ে বড় ডাকাতদল। এরা মূলত শরণখোলা রেঞ্জে বেশি তৎপর। চাঁদপাই রেঞ্জেও হানা দেয়। কালু ধরা পড়েছে, কিন্তু তার বাহিনী জঙ্গলে এখনও ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে। এছাড়া ১০-১২ জনের ছোট ছোট বাহিনীর উৎপাত রয়েছে বনের সর্বত্র। গত বছর কোস্টগার্ডের সদস্যদের সঙ্গে জোংরা, ভদ্রার ভারানী, ঝাপসিতে ডাকাতদের

বনমাঝিরা উসখুস করছিল। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম রাতে আমাদের জাহাজ এখানে রাখার ইচ্ছায় তারা আতঙ্কিত। এটা নাকি ডাকাতদল হাফিজ বাহিনীর চলাচলের পথ। অতএব, চারজন সশস্ত্র বন কর্মচারী সঙ্গে থাকার পরও আমরা বীরের মতো পশ্চাৎপসারণ করে আদাচাকী বন অফিসের সামনের নদীতে রাত কাটাতে এলাম

গুলিবিনিময় হয়। এতে কোস্টগার্ডের এক সদস্যের পায়ে গুলি লেগে মারাত্মক জখম হয়। ডাকাতদের দু'জন মারাত্মক আহত হয়। ডাকাতরা জঙ্গলে উঠে যেতে সক্ষম হয়। আহত দু'জন ধরা পড়ে। এদের কাছ থেকে নাইন শুটার বন্দুক উদ্ধার হয়। বন বিভাগের ধারণা, এদের হাতে রাইফেলও ছিল।

কয়েক মাস আগের ঘটনা। চাঁদপাই রেঞ্জের চরাপুটিয়া ক্যাম্পের একজন বন কর্মচারীর ওপর ডাকাতদের রাগ ছিল। এই বন কর্মচারীর জন্য তাদের ডাকাতির অসুবিধা হচ্ছিল। একদিন ডাকাতরা খবর পায় বনবাগান সৃষ্টির কাজে ঐ বন কর্মচারীটি অফিস থেকে কিছুটা দূরে মজুরদের নিয়ে জঙ্গলে কাজ করবে। দিনে-দুপুরে ডাকাতদের একটি সশস্ত্র দল ঐ এলাকা ঘিরে ঐ কর্মচারীরকে খুঁজতে থাকে। সৌভাগ্য যে, সে ঐ দিন অফিসেই ছিল। ডাকাতরা চলে যাবার সময় বলে যায়, ঐ বন কর্মচারীর দুই হাত কেটে নিতে তারা এসেছিল। সুন্দরবনের তারজালি জেলের দল (এরা পোষা ভোঁদরের সাহায্যে মাছ ধরে) আগেকার দিনগুলোয় চাঁদপাই থেকে সুপতি এলাকা পর্যন্ত মাছ ধরতে যেত। এখন তারা তাম্বুলবুনিয়া বন অফিসের আশপাশের এলাকা পর্যন্ত যাতায়াত করে। এর বাইরে যেতে সাহস পায় না ডাকাতদের ভয়ে। অনেকে পেশা ছেড়ে দিচ্ছে। এখন যারা কাজ করছে তারা নিয়মিত মাসোহারা দেয়।

গত বছর এক বড়িয়ালের সঙ্গে দেখা হারবাড়িয়া খালে। বড়িয়াল বড়শি দিয়ে মাছ ধরে। গলদা চিংড়ি, রুচো, দাতিনা, কাইন মাগুর, নোনা ট্যাংরা তারা বড়শিতে পায়। ছোট নৌকা নদীতে রেখে মাছ ধরে এরা। বড়িয়ালরা ৪-৫ জন ৪-৫টি নৌকায় পৃথক স্থানে মাছ ধরে। নৌকার পাশে বাঁধা থাকে বাঁশের হাফর, এর মধ্যে মাছ জিইয়ে রাখা হয়।

আমরা কথা বলার সময় বড়িয়াল তার সরঞ্জাম গুটিয়ে রওনা হচ্ছিল। তার পাসের মেয়াদ আরও কিছুদিন আছে, তবু কেন সে চলে যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করায় জানালো, সে এ গ্রেডের কতগুলো চিংড়ি ধরেছে, ডাকাতরা এগুলো ছিনিয়ে নেবার আগেই সে মহাজনের ঘাঁটিতে পৌছাতে চায়। আরও জানতে পারলাম, গত পরশু ডাকাতরা চাঁদা নিয়ে গেছে পঞ্চাশ টাকা, আর বনবিভাগ নিয়েছে ৩০ টাকা। সে তো পাস নিয়ে মাছ ধরতে এসেছে, তার ওপর বন বিভাগের কিসের চাঁদা দিতে হয় জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলাম, বন পাহারার জন্য বন বিভাগের টহল ফাঁড়িগুলোতে সরকার ট্রলার বরাদ্দ করেছে। কিন্তু ট্রলার চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় তেলের কোনো বরাদ্দ নেই। বন কর্মচারীরা তবু নিয়মিত উৎসাহের সঙ্গে পাহারা দেয়। কারণ অবৈধ কিছু ধরতে পারলেই কাঁচা টাকা পাওয়া যায়, আর ট্রলারের তেল কেনার টাকা আদায় করা হয় পাস করা বন পেশাদারের ওপর চাঁদা ধরে। চাঁদা আদায় করতে গিয়ে অনেক সময় খাবার মাছ তুলে নেয় বন কর্মচারীরা।

কয়েকদিন আগে চাঁদপাই থেকে সামান্য দক্ষিণে মৃগমারী ক্যাম্পের সামনের দিয়ে প্রবাহিত সোনামুখী খালের উদ্দেশে সকাল ৮টার দিকে রওয়ানা দিয়েছি। জোয়ার ঠেলে উজিয়ে যেতে হওয়ায় মাঝিরা ছোট নৌকাটি নদীর পশ্চিম পাড়ে নিয়ে এলো। নদীর পাড়ে ধানসি গাছে ধান হয়েছে, পেছনে কিছু নল ঘাস তার পরই ঘন জঙ্গল শুরু হয়েছে। দেখলাম কয়েকজন নারী-পুরুষ জ্বালানি কেটে নৌকায় ভরছে। আমাদের দেখে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু কাঠ কাটা দল আমাদের নৌকা চালকদের পরিচিত হওয়ায় ধাতস্থ হলো। আমাদের জানালো, সামনেই পূর্বপাড়ে বড় মোরগমারী খালে চার জনের একটি ডাকাতদল খালপাড় ধরে ভেতরে ঢুকেছে। একজনের গায়ে নীল গেঞ্জি। এখন গোনের সময়, জেলে নৌকা ধরবে সম্ভবত। আমাদের ওদিকটায় যাওয়ার প্রয়োজন থাকলেও নৌকা ফেরালাম। আশ্চর্য হলাম রেঞ্জ অফিস, পুলিশ ক্যাম্পের এতো কাছেও ডাকাত আসে! নৌচালকদের কাছে শুনতে পেলাম এরকম ডাকাতদলের সন্ধান তারা প্রায়ই পায়। পুলিশের কাছে কেন খবর দেয় না, জিজ্ঞাসা করায় বলল, পুলিশ এসে আমার নৌকাতে উঠে বলবে ওখানে নিয়ে চল। আমার সারা দিনটা নষ্ট। আবার অনেক সময় না পেলে চড়চাপাটি দেয়।

এ ধরনের ঘটনা প্রতিদিন সুন্দরবনের কোনো না কোনো অঞ্চলে ঘটছে। বর্তমানে সুন্দরবনে সবচেয়ে বড় সমস্যাই হচ্ছে ডাকাতি।

ডাকাতির ঐতিহ্য

সুন্দরবনে ডাকাতি নতুন সমস্যা নয়, চম্বল উপত্যকার মতো ক্রনিক সমস্যা। অনাদিকাল থেকে যেসমস্ত ভূস্বামী উত্তরাঞ্চলে পরাজিত হয়েছে, এরা আশ্রয় নিত সুন্দরবন অঞ্চলে। কেন্দ্রের শাসন সে কালে তো এই অঞ্চলে পৌঁছাতোই না, একালেও পৌঁছায় না। ফলে এক দল অন্য দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। মধ্যযুগে (১৫৯৮) পর্তুগিজ জেসুইট পাদ্রী ফার্নান্দেজ ও ফনসোসা বাকলা (বরিশালের দক্ষিণাঞ্চল) থেকে চন্ডিকান (বর্তমান সাতক্ষীরার দক্ষিণাঞ্চল) পর্যন্ত জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নৌকায় ভ্রমণ করেছিলেন। ফন সোসার ভ্রমণ বিবরণীতে ডাকাতের উৎপাতের কথা আছে। তারা ডাকাতদের নিক্ষিপ্ত তীরের হাত থেকে কোনো রকমে পালাতে পেরেছিল। ১৫৪৫ সাল থেকেই দক্ষিণ বাংলায় পর্তুগিজ এবং আরাকান জলদস্যুরা অত্যাচার করতে শুরু করে। রাজা প্রতাপ আদিত্য আরাকান জলদস্যুদের খুশি রাখতে পর্তুগিজ জলদস্যু সেনাপতি কার্ভালহোকে হত্যা করলে সুন্দরবনাঞ্চলে এদের উৎপাত অনেকটা কমে আসে। কিন্তু প্রতাপ আদিত্যের পরাজয় এবং বাকলার রাজা পরমানন্দ রায় ১৫৫৯ সালে পর্তুগিজদের সঙ্গে সন্ধি করে রাজধানী চন্দ্রদ্বীপ থেকে মাধব পাশায় স্থানান্তর করলে (কন্দর্পনারায়ণের আমলে) মগ-পর্তুগিজরা যে অরাজকতা সৃষ্টি করে সেটা মানব ইতিহাসে ভয়ঙ্কর কলঙ্কিত অধ্যায়। মুঘলদের নৌ-সেনাবাহিনী ছিল দুর্বল, সুন্দরবনাঞ্চলে তাদের কোনো প্রভাবই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ১৫৬০ থেকে শায়েস্তা খানের ১৬৬২ সালে চট্টগ্রাম দখলের ১০২ বছর মগ-পর্তুগিজ এবং প্রতাপ আদিত্যের সেনাবাহিনীর পরাজিত অংশ সুন্দরবনসহ বঙ্গোপসাগরের সমগ্র দ্বীপাঞ্চল এবং উত্তরের বসতি বিরান করে দিয়েছিল। মুঘল আমলের শেষের দিকে কেন্দ্রের দুর্বলতায় নতুন করে ডেনমার্ক, হল্যান্ড, ফরাসি এবং সবশেষে ইংরেজ জলদস্যুরা দক্ষিণাঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে। আলীবর্দী খাঁর আমলে আগা বাকের বরিশাল এলাকায় আবাদ শুরু করলে পুনরায় ডাকাতি শুরু হয়। ব্রিটিশ আমলে বরিশাল, দক্ষিণ খুলনার চাল কোলকাতায় নেয়া হতো। স্থানীয় ডাকাতরা কারবারীদের ওপর হামলা চালাতো। এ ছাড়া বন্দোবস্ত পাওয়া নতুন জমিদার একে অন্যের ওপর নিজস্ব বাহিনী নিয়ে ডাকাতি, জবরদখল চালাতো। ব্রিটিশ আমলের মাঝামাঝি স্থানীয় ডাকাতদের সঙ্গে কিছু ব্রিটিশ ডাকাতের নামও শোনা যায়।

এরাটুন নামে এক বিখ্যাত ডাকাত নরহত্যাসহ ২৪টি মারাত্মক ডাকাতির পর ধরা পড়ে। ব্রিটিশ আমলের শেষের দিকে আইনের শাসন কিছুটা ফিরে আসে। কিন্তু ডাকাতির নতুন অধ্যায় শুরু হয় ১৯৪৭ সালে। ভারত-পাকিস্তান পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হলে

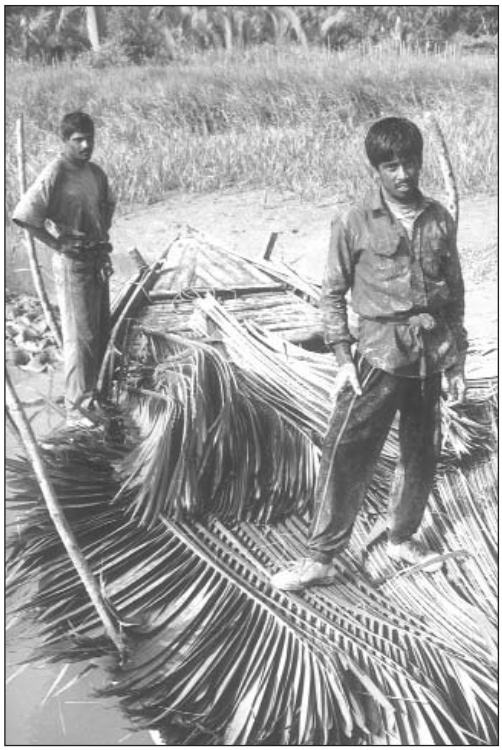

গরিব মানুষদের অকাতরে সাহায্য করতো, বন বিভাগের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে তার ছিল দহরম মহরম। স্থায়ী নিবাস গড়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাটে। ছেলেপেলেদের পড়াশোনাও করিয়েছে। বাছেরের দলে নৈতিকতা কঠোরভাবে মানা হতো। মেয়েদের ওপর অত্যাচার হলে বাছের নিজে বিচার করতো

সীমান্তের এপারের ডাকাত ওপারে, ওপারের ডাকাত এপারে ডাকাতি করে পালানোর সুযোগ পায়। ততদিন পর্যন্ত ডাকাতরা জেলে বাওয়ালিদের তেমন অত্যাচার করতো না। পাকিস্তান আমলে দক্ষিণের সুন্দরবন সংলগ্ন ধনী কৃষক এবং চোরাকারবারীরা ছিল ডাকাতদের প্রধান শিকার। '৪৭-এর পর ঢাকা জেলার অধিবাসী দরবার ডাকাত সবচেয়ে কুখ্যাত, নিষ্ঠুর হিসেবে পরিচিতি পায়। দরবার ঘাঁটি করেছিল সুন্দরবনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বেয়ালা কয়লা নামক দুর্গম এলাকায়। দরবার কাঠের ঘেরিদার, চোরাকারবারীসহ, গ্রামাঞ্চলে ডাকাতি করতো। বন বিভাগের পেট্রোল বোট আক্রমণ করে দুটি রাইফেল সে হাতিয়ে ছিল। ডাকাতরা সে সময় ব্যবহার করতো বন্দুক, দেশী গাদাবন্দুক, রামদা, কুড়াল, কাতরা, কালি, ঢাল প্রভৃতি অস্ত্র। দরবার তার টুআইসি বাছের ডাকাতের হাতে নিহত হয়। দরবারের সমসাময়িক দারোগা ডাকাত (পুলিশ কনস্টেবল ছিল, নিজেকে জাহির করতো দারোগা নামে), মোকসেদ, বর্ম্মা (বাড়ি বর্ধমান) ও পিরোজপুরের সৈয়দ আলী।

দরবারকে খুন করার পর বাছের সুন্দরবনের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে পড়ে। পাইকগাছা এলাকায় জন্ম নেয়া বাছের ঢালী ছিল অনেকটা কিংবদন্তীর ডাকাত। গরিব মানুষদের অকাতরে সাহায্য করতো, বন বিভাগের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে তার ছিল দহরম মহরম। স্থায়ী নিবাস গড়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাটে। ছেলেপেলেদের পড়াশোনাও করিয়েছে। বাছেরের দলে নৈতিকতা কঠোরভাবে মানা হতো। মেয়েদের ওপর অত্যাচার হলে বাছের নিজে বিচার করতো। এমনি বিচারে আপন ভাগনেকে হত্যা করে। বাছের সবসময় বড় বড় জোতদার বাড়িতে হামলা করতো। চোরাকারবারীদের সঙ্গে তার চুক্তিবাধা ছিল। মালামাল অনুযায়ী টাকা দিতো। খুলনার রয়জদ্দি বিড়ি কোম্পানি ভারত থেকে চোরাইপথে বিড়িপাতা আনতো বাছেরকে চাঁদা দিয়ে। এছাড়া চোরাকারবারী চাউলা হাসান, (পরবর্তীকালে পাক ওয়াটার ওয়েসের মালিক) সবুর খানের (পরবর্তীকালে আইয়ুব সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী) দল থেকে বাছের নিয়মিত চাঁদা আদায় করতো। ১৯৬৭ সালে নিজগ্রামে এক আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় বাছের ধরা পড়ে। সমসাময়িক ডাকাত ছিল ফর্সা চেহারার, রায়েন্দার রাঙ্গা আসেদ, মতিউল্লা, কালে খাঁ, গণি মিঞা মন্টু ইত্যাদি।

স্বাধীনতার সময় মুক্তিবাহিনীর হাতে কিছু ডাকাত মারা পড়ে। অধিকাংশই ডাকাতি ছাড়তে বাধ্য হয়। কিন্তু '৭৩ সালে গণবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্য সুন্দরবনে আশ্রয় নেয়। '৭৪ সালে দক্ষিণাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়লে ডাকাতের উপদ্রব আবার শুরু হয়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে রান্না করা ভাত পর্যন্ত ডাকাতি হতো। এ সময় বড় দলের ধামরাইল্যা এলাকার ডাকাত সর্দার ওসমান খাঁর নাম বেশ শোনা যেত। '৭৬-এ ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে থাকতো। ধরা পড়ে সাত বছর জেল খেটে আবার ডাকাতি শুরু করে। ম্যাট্রিক পাস এ ডাকাত বড়দল, আশাশুনি, সুন্দরবন এলাকায় অনেকগুলো ডাকাতির পর ধরা পড়ে জেলে যায়। ডাকাতির আগে সে গরাণকাটা বাওয়ালীর কাজ করতো।

সুন্দরবনে দীর্ঘদিন ধরে গডফাদারগিরি করে চলেছে সোরা এলাকার সোরাব হাজী। '৭১ সালে পাকবাহিনীর সহায়তায় মুক্তিবাহিনীর একটি দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় সোরাব হাজী। এতোকাল জামায়াতের রাজনীতি করলেও বর্তমানে বিএনপির স্থানীয় নেতা। মাস ছয়েক আগে যৌথবাহিনী তার বাড়ি থেকে ৩০ লাখ টাকা মূল্যের কাঠ উদ্ধার করে। মালেক নামের এক খোঁড়া ডাকাত তার দোসর। সোরাব এক সময় বাওয়ালির গোমস্তা ছিল। গোলখালীর পিস কমিটির চেয়ারম্যান হয় ১৯৭১ সালে। এর পরই বাঘ-কুমিরের চামড়া বিক্রি, খুন, রাহাজানি, জমি দখল তার পেশায় পরিণত হয়। বাওয়ালি ও মৌয়াল দলের মহাজন হওয়ায় তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হাজির করতে কেউ সাহসী হয় না। নবতিপর এই ঐতিহাসিক অপরাধী এখনও সক্রিয়।

বৈদ্যমারী এলাকার মকিম ডাকাত ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক ছিল। চল্লিশের দশকে সে ডাকাতি শুরু করে সত্তরের দশকের শেষ প্রান্তে মারা যাবার আগ পর্যন্ত ডাকাতি করে গেছে। মূলত সে ভাড়াটিয়া ডাকাত ছিল। বাওয়ালীকুপ থেকে মুক্তিপণ আদায়, বনবিভাগের জমি দখল, বনে আগুন লাগানো, হিন্দুদের জমি দখল প্রভৃতি অপকর্মে সিদ্ধহস্ত ছিল। কয়েকবার জেল খেটেছে। তার সঙ্গী ছিল কালু, সাত্তার, আয়ুব আলী, নবাব আলী প্রভৃতিরা। এদের মধ্যে কালু পরবর্তীকালে নিজেই বিরাট ডাকাতদলের অধিপতি হয়ে পড়ে।

সমসাময়িককালে ন'বেঁকী এলাকার শামসু ডাকাতের দলবলের অত্যাচারের অনেক কাহিনী শোনা যায়।

সুন্দরবনের বানিয়াখালী এলাকার চেয়ারম্যান শাহাবুদ্দিন ও তার ভাইয়ের বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে ডাকাতদল পোষে। এরা গুলি করে, বিষ দিয়ে বাঘ মেরে চামড়া বিক্রি, হরিণ মারা দলের পৃষ্ঠপোষকতাও করে ডাকাতির সঙ্গে সঙ্গে। শাহাবুদ্দিন বাহিনী এখন সক্রিয়।

১৯৮৮ সালের দিকে শরণখোলা রেঞ্জ এলাকায় দোয়েলবাহিনী নামে একটি খুনি ডাকাতদের অত্যাচার চরমে পৌঁছে। এই বাহিনী ঐ বছর মরাভোলা কুপ অফিসে ডাকাতি করে দুই বনকর্মচারীকে মেরে রাইফেল লুট করে। এ বাহিনীটির স্থায়ী অবস্থান ছিল লাঠিমারা কোকিলমুনি এলাকায়। বনবিভাগ, পুলিশের সঙ্গে ক্রমশ সংঘর্ষে দোয়েল বাহিনী শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালের কুখ্যাত ডাকাত গুলশাখালী এলাকার রাজাপুর গ্রামের বাদল পেয়াদা। বাদল ছোটখাটো ফর্সা আদলের ভয়ঙ্কর খুনি হিসেবে পরিচিত ছিল। বাদল প্রকৃত পক্ষে দোয়েল বাহিনীর ডাকাত সর্দার খালেক, মানিক ও রুস্তমের দলকে একত্রিত করে বিশাল বাহিনী তৈরি করেছিল। বন বিভাগের নিম্নপদস্থ অনেক

ডাকাতদলের সঙ্গে এরা সহসা সংঘাতে যেতে চায় না। এদের অধিকাংশের দেশের বাড়ি সুন্দরবনের লাগোয়া গ্রামগুলোয়। অপরাধী চক্রের অনেকেই এদের আত্মীয়স্বজন। বনে যে সমস্ত ডাকাত মারা পড়ে এদের অধিকাংশই দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, ছোট দলগুলোর ওপর বড় দলের আক্রমণ, পুলিশকে মাসোহারা না দেয়া অথবা বন বিভাগ বা কোস্টগার্ডের সামনে হঠাৎ পড়ে যাওয়া

কর্মচারী বাদলবাহিনীকে সহায়তা করেছে। তাম্বুলবুনিয়া টহলফাঁড়ির কাছাকাছি কয়েকটি বাইনগাছে মাচা করে বাদল ঘাঁটি গড়েছিল। বন বিভাগ ও পুলিশের যৌথ অভিযানে বাদলের ঘাঁটি নষ্ট হয়, একজন ডাকাত প্রাণ হারায়। ঘাঁটিতে ১২ বস্তা আটা, চাল, বিস্কুটসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। তাম্বুলবুনিয়া অফিসের সামনে দিয়ে শেলা নদীতে শিকার ধরতে বের হবার সময় বাদলবাহিনী টর্চের সঙ্কেতে জানিয়ে যেত যাতে সেন্ট্রি চ্যালেঞ্জ না করে। বাদল ধরা পড়ে নিজ গ্রামে। উত্যক্ত গ্রামবাসী তার চক্ষুদ্বয় উপড়ে ফেলে।

রায়েন্দার তাফালবাড়ী এলাকার ডাকাত সর্দার কালু অন্যতম নৃশংস ডাকাত। তার কুকীর্তির অন্যতম শাপলা টহল ফাঁড়িতে ডাকাতি, বলেশ্বর নদীর মোহনায় ইলিশ ধরা ট্রলারে ডাকাতি, কাঠ চুরি, জ্ঞানপাড়ার হরিণচোরদের সঙ্গে চুক্তি করে মাসোহারা নেয়া। ১৯৯০ সালে ধরা পড়ে কিন্তু সাক্ষীরা ভীত থাকায় খালাস পেয়ে ডাকাতি করে চলেছিল। প্রধান ঘাঁটি চরাবেতমোর এলাকায়। কালু যৌথবাহিনীর হাতে গতবছর ধরা পড়ে জেলে আছে, তবে তার বাহিনী এখনো ডাকাতি করে চলেছে। এছাড়া ছোট ছোট খুচরা অসংখ্য বাহিনী সুন্দরবনের গহনে রয়েছে। এদের একটি বাহিনীর নাম ছিল টাইগার বাহিনী। এতে মেয়ে সদস্যও ছিল। দলটি ডাকাত দলের অন্তর্কলহে শেষ হয়ে যায়।

ডাকাত, বন প্রশাসন ও গডফাদার

ডাকাতদের অধিকাংশই এক সময় জেলে, বাওয়ালীর পেশায় ছিল। ডাকাত দলের হাতে ধরা পড়ে ইনফরমারের কাজ করতে বাধ্য হয়ে অনেকে ডাকাত হয়ে পড়েছে। গ্রাম থেকেও অনেকে রিক্রুট হয়েছে। পুলিশ, বিডিআর, আনসারের কিছু সদস্য অপরাধের জন্য চাকরি হারিয়ে ডাকাত সর্দার হয়েছে। অনেকের অপরাধ-জীবনের শুরু কাঠ চুরির মাধ্যমে। বড় ডাকাতদলকে সবসময় পুলিশকে মাসোহারা দিতে হয়। কাঠচোর, হরিণ চোররাও পুলিশকে মাসোহারা দেয়। ডাকাতির খাতায় একবার নাম উঠলে পুলিশের অত্যাচারে ডাকাতিতেই ফিরে আসতে হয়। '৯০ সালের দিকে এক হরিণধরা দলের সর্দার আমাকে জানিয়েছিল যে তাদের এলাকা জ্ঞানপাড়ার ছোট ট্যাংরা পুলিশ ক্যাম্পের হাবিলদার জাহাঙ্গীরের হাতে পনেরো দিন পরপর আড়াই হাজার টাকা দিতে হতো। হরিণ ধরতে না গেলে পুলিশ ক্যাম্পে ধরে এনে মারধর করা হতো। শরণখোলার উত্তরে যে সমস্ত করাতকলের মালিক আছে এদের কমবেশি প্রায় সবাই কাঠচোরদের মাল বিক্রয়কারী। এদের মালামাল পাহারা দেবার জন্য ডাকাতবাহিনী ভাড়া করে। জহির বাহিনী, সামাদ বাহিনী (সাউথখালী) রায়েন্দার করাতকলের মালিকরা সৃষ্টি করেছিল চোরাইকাঠ পাহারা দেবার জন্য। ছামাদ বাহিনীর সঙ্গে গোলাগুলিতে একজন পুলিশের এসপি কোনোরকমে বেঁচে আসে। অন্য এনকাউন্টারে ছামাদ মারা পড়ে। ১৯৯৩ সালের দিকে খুলনার মিন্টু কমিশনারের দুর্দান্ত প্রতাপের কথা জানা যায়। সুতারখালী স্টেশন অফিসে মিন্টুবাহিনীর ট্রলার কাঠ কেটে নিয়ে যাচ্ছে শুনতে পাই। মিন্টু বাহিনী খুলনায় বসেই কাঠ নিলাম নিয়ন্ত্রণ করতো। মরাভদ্রা, নিশানবাড়িয়া, হড্ডোরা প্রভৃতি এলাকার ডাকাতদল মিন্টু বাহিনীর আশীর্বাদপুষ্ট। মাছ ব্যবসায়ীরা ডাকাতদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ডাকাতরা তাদের হাতিয়ার জঙ্গলে রেখে আসে, আর আসা যাওয়ার সময় মাছ ব্যবসায়ীদের ট্রলারে যাতায়াত করে। সুন্দরবনের নিম্নপদস্থ বনবিভাগের কর্মচারীদের একটা বড় অংশ কাঠচোরদের কাছ থেকে টাকা পেয়ে থাকে। ডাকাতদলের সঙ্গে এরা সহসা সংঘাতে যেতে চায় না। এদের অধিকাংশের দেশের বাড়ি সুন্দরবনের লাগোয়া গ্রামগুলোয়। অপরাধী চক্রের অনেকেই এদের আত্মীয়স্বজন। বনে যে সমস্ত ডাকাত মারা পড়ে এদের অধিকাংশই দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, ছোট দলগুলোর ওপর বড় দলের আক্রমণ, পুলিশকে মাসোহারা না দেয়া অথবা বন বিভাগ বা কোস্টগার্ডের সামনে হঠাৎ পড়ে যাওয়া।

নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত ডাকাত দল সম্পর্কে বন প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র। এ সময় বন বিভাগ তাদের ওপর আক্রমণ না হলে সহসা ডাকাত ধরতে উৎসাহী হতো না। বন বিভাগ চাইতো না সুন্দরবনের বন প্রশাসনে যে বিরাট দুর্নীতি চলে সেটা বাইরের মানুষের কাছে প্রকাশিত হোক। ডাকাত- ভীতি সাংবাদিকদের বন হতে দূরে রাখতো কিন্তু পরবর্তীতে

ডাকাতরা বন প্রশাসনের সঙ্গে ভাগীদার হয়ে পড়ায়, বিশেষ করে ডাকাতদের হাতে উন্নত অস্ত্র, রাজনৈতিক আশীর্বাদ চলে আসায় মাঝেমধ্যে কোস্টগার্ডের সহায়তায় ডাকাত ধরতে বের হয়। কিন্তু সমন্বয়হীনতায় কাজ হয় সামান্য। সুন্দরবনের সমস্ত ডাকাতদের অবস্থান এবং সদস্যদের বন বিভাগের লোকজন চেনে। কিন্তু কেন তারা ডাকাতমুক্ত করছে না জিজ্ঞাসা করায় একজন বন কর্মকর্তা কতগুলো সমস্যার কথা জানালেন যেগুলো প্রণিধানযোগ্য। বন বিভাগের গুলিতে ডাকাত মারা পড়লে তার জন্য যথোপযুক্ত সাক্ষীসহ কৈফিয়ত দিতে না পারলে চাকরিচ্যুতসহ খুনের মামলায় পড়তে হয়। ডাকাত ধরা পড়লে তাদের পুলিশের মাধ্যমে কোর্টে চালান দিতে হয়। পুলিশ এদের অধিকাংশকেই ছেড়ে দেয় গডফাদারদের চাপে, নয়তো ঘুষের বিনিময়ে। কেস চলাকালীন বন কর্মীদের দূরের স্টেশন থেকে হাজিরা দিতে আসতে লোকালয়ে ডাকাত দলের সহযোগীদের হাতে নাজেহাল হতে হয়। ডাকাতদের ডিফেন্ড করার জন্য একদল আইন ব্যবসায়ী আছে যাদের সহায়তায় ডাকাতরা সহজেই জামিন পেয়ে জঙ্গলের পথে পা বাড়ায় আর সুযোগে থাকে বদলা নেবার। ১৯৯৫ সালে বানিয়াখালি স্টেশন অফিসের কাছে বন বিভাগের লোকজন স্থানীয় জনতার সহায়তায় তিনজন ডাকাত ধরে। এদের অফিসে এনে কোর্টে চালান দিতে প্রস্তুতি নিতে গেলে এক এসআইয়ের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ডাকাতদের তাদের হাতে দিতে বলে। বন কর্মকর্তা রাজি না হলে দু'দলের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হয়। বাধ্য হয়ে বন বিভাগ ডাকাতদের হস্তান্তর করে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায় সুন্দরবন এলাকার জনপ্রতিনিধি মেম্বার, চেয়ারম্যানদের একটা বড় অংশ ডাকাতদের আশীর্বাদপুষ্ট, অথবা ডাকাতদল পোষে। এসব জনপ্রতিনিধিরা খুলনার বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা, ওয়ার্ড কমিশনারের আজ্ঞাবহ। বনের পাশের চিংড়ি ঘের মালিকদের কাছ থেকে চাঁদা তোলার মধ্যস্থতাকারী এসব জনপ্রতিনিধি। বিরোধ বাধলে ডাকাত দলকে ব্যবহার করা হয়। ডাকাত দলকে অস্ত্র সরবরাহ করে খুলনার গডফাদাররা আর সেটা নিয়ন্ত্রণ এবং বহন, বিতরণের ভার নেয় জনপ্রতিনিধিরা। কয়েকদিন আগে র‍্যাবের হাতে নিহত কমিশনার লিটু ছিল সবচেয়ে বড় অস্ত্র সরবরাহকারী। লিটুর লোকজন সরাসরি স্পিডবোটে চড়ে সুন্দরবন পৌঁছে মোতালেব বাহিনীকে অস্ত্র দিচ্ছে এমন ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী পাওয়া বিরল নয়।

ডাকাত দলের সদস্যরা মাসে পনেরো দিন জঙ্গলে কাটায়। অমাবস্যা বা পূর্ণিমার গোনের সময়টায়। তবে গোলপাতা বা গরান কুপ পড়লে মাসব্যাপী তাদের থাকতে হয়। রাজনৈতিক প্রভাব, অস্ত্র বলে এখন ডাকাতরা বন বিভাগের সঙ্গে দ্বৈত শাসন চালাচ্ছে সুন্দরবনে। ৬০০০ বর্গকিলোমিটারের সুন্দরবন এলাকা ব্যবস্থাপনায় রাখতে মাত্র ১২০০ নানা পদের কর্মকর্তা-কর্মচারী, এবং সোয়াশ'র মতো যান্ত্রিক যান (যার এক তৃতিয়াংশ নষ্ট থাকে) বন বিভাগের হাতে রয়েছে। অস্ত্রপাতি অকার্যকর। ফলে দিনের বেলা বনবিভাগ কিছুটা কর্মতৎপর থাকলেও রাতে, বিশেষ করে গভীর বনে স্থাপিত ক্যাম্পগুলোর কর্মচারীরা নিজেদের অস্ত্র বাঁচাতে ক্যাম্পেই গুটিয়ে থাকে। রাতের শাসন চলে যায় ডাকাত, কাঠচোর, হরিণচোরদের হাতে। সাম্প্রতিক অতীতে সুন্দরবনের সবচেয়ে কুখ্যাত ডাকাত ছিল কবিরাজ তালুকদার। দুবলা দ্বীপের পূর্বে নারকেলবাড়িয়ায় বনের ভেতর সে ঘাঁটি করেছিল। জঙ্গলে ডাকাতি, মাছধরা ট্রলার মেরে দেয়া, বহিঃসমুদ্রে জেলেদের ওপর হামলা, কাঠ চুরি, হরিণ চুরির কাজে সিদ্ধহস্ত ছিল তার দল। প্রতিদ্বন্দ্বী মাছ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে তার মৃত্যু হয়।

সুন্দরবনের কিংবদন্তির মুক্তিযোদ্ধা মেজর জিয়াউদ্দিন স্বাধীনতার পর সদলবলে জাসদের গণবাহিনীতে যোগ দিয়ে এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেন। এ সময় বনবিভাগ, পুলিশ, রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে তার বাহিনীর কয়েকটি এনকাউন্টার হয়। ১৯৭৩ সালে রক্ষীবাহিনীর হাতে তিনি ধরা পড়েন। ছাড়া পেয়ে চট্টগ্রাম থেকে আগত শুঁটকি মাছ ব্যবসায়ীদের একত্রিত করে দুবলা মাছ ব্যবসায়ী কো-অপারেটিভ চালু করেন। এই কো-অপারেটিভ আইন করে দেয় সুন্দরবনের পূর্বাঞ্চল থেকে মালঞ্চ নদীর মোহনা পর্যন্ত এলাকায় যারা মাছ ধরবে তারা কো-অপারেটিভকে তাদের ধার্যকৃত দরে মাছ দিতে বাধ্য থাকবে। ফলে অন্যান্য মাছ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কো-অপারেটিভের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। উভয়পক্ষই নিজেদের দলকে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে। '৮০ সালের প্রথম দিকে জিয়া উদ্দিনের দলের কবিরাজ ও মুক্তা কো-অপারেটিভ থেকে বের হয়ে নিজেদের দল গড়ে। কবিরাজের দল ছিল দুর্ধর্ষ। জিয়াউদ্দিনের বাহিনীর সঙ্গে প্রায়ই তার দলের সংঘর্ষ হতো। এর মধ্যে সুন্দরবনের তৎকালীন হামবড়া ডিএফও গোলাম হাবীব (জেনারেল এরশাদের আত্মীয়, সুন্দরবনে দু'দফায় ডিএফও ছিল, পরবর্তীতে বন বিভাগের সিসিএফ এবং বর্তমানে জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত এমপি) জিয়াউদ্দিনের প্রভাব সহ্য করতে পারতো না। তার ধারণায় সে-ই সুন্দরবনের মা-বাপ। সে একবার দলবল নিয়ে মেজর জিয়াউদ্দিন জেলেদের খাবার পানির ব্যবস্থা করার জন্য যে পুকুর কাটিয়েছে সেই পুকুর পাড়ের নারকেল চারা উপড়ে, জেলেদের ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে নিজের ক্ষমতা জাহির করেছে। জিয়াউদ্দিনের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য সে খাজুরিয়ায় ওয়াহেদ খান নামক নামক একজন শক্তিশালী মাছ ব্যবসায়ীকে বসায়। জিয়াউদ্দিনের দল থেকে বহিষ্কৃত মুক্তাকে শেলারচরের পত্তনী দেয়। শোনা যায়, কবিরাজের দলকেও সে উৎসাহ যোগাতো। এর মধ্যে কবিরাজের অত্যাচার বাড়লে, বিশেষ করে মুক্তার দলের মাছধরা ট্রলারে হামলা চালালে মুক্তা প্রতিজ্ঞা করে যতদিন কবিরাজকে মারতে না পারবে ততোদিন সে খাটে শোবে না, মাটিতে ঘুমাবে। কবিরাজকে শায়েস্তা করতে সে জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে সন্ধি করে। এবার দিনে দিনে কবিরাজ কোণঠাসা হতে থাকে। জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে সে ঢাকা পর্যন্ত যাতায়াত করে। এর মধ্যে জিয়াউদ্দিনের দলের সঙ্গে সংঘর্ষের পর তার মৃতদেহ সুন্দরবনে পাওয়া যায় ১৯৮৪ সালে। অসমর্থিত সূত্রে শোনা যায়, কবিরাজ মারা গিয়েছিল পিরোজপুর। তার দেহ জঙ্গলে ফেলে দেয়া হয়। মুক্তা কবিরাজের অবর্তমানে এলাকায় আধিপত্য কায়েম করে, কারণ এরই মধ্যে জিয়াউদ্দিন মাছ ব্যবসায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করে। গত বিএনপি সরকারের আমলে মেজর জয়নাল আবেদিনের মাছ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান জিয়াউদ্দিনের প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা করে। তার দলের হাতে বেশ অস্ত্র ছিল। কিন্তু সরকার পতন, নিজের জীবনের কিছু বিপর্যয়ে সে ঠান্ডা হয়ে যায়। পরবর্তীতে মুক্তা খুলনার কমিশনার নির্বাচিত হয়। সুন্দরবনের পূর্বাঞ্চলের ডাকাতদল, হরিণ চোরাদলের আস্তানা মুক্তার এলাকার (শেলারচর, টিয়ারচর, কোকিলমুনি, জাফা, চানমিঞাখালী, হরমল, পাঠাকাটা, বেতমোর) অন্তর্ভুক্ত। এ সমস্ত এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে মুক্তা কমিশনার।

বাদল ছোটখাটো ফর্সা আদলের ভয়ঙ্কর খুনি হিসেবে পরিচিত ছিল। বাদল প্রকৃত পক্ষে দোয়েল বাহিনীর ডাকাত সর্দার খালেক, মানিক ও রুস্তমের দলকে একত্রিত করে বিশাল বাহিনী তৈরি করেছিল। বন বিভাগের নিম্নপদস্থ অনেক কর্মচারী বাদলবাহিনীকে সহায়তা করেছে। তাম্বুলবুনিয়া টহলফাঁড়ির কাছাকাছি কয়েকটি বাইনগাছে মাচা করে বাদল ঘাঁটি গড়েছিল